

সূচিপত্র

১১	যাত্রার শুরুতে বিস্ময়কর কুরআন
২০	কুরআনের মৌলিক ভাববস্তু
২৮	বহুকাল আগে...নবি-রাসূল ও পূর্ববর্তী জাতিসমূহের কথা
৩২	পরকাল : আমার আসল গন্তব্য
৪৩	কেন কুরআনে বিশ্বাস করব
৬১	একটি ধ্রুবতারা; কুরআনের চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা
৭২	সাহিত্য সন্ধান; কুরআনের অতুলনীয় সাহিত্যগুণ
৭৯	গঠনামৃত; নির্ভুল কাঠামোয় স্রষ্টার নিদর্শন
৮৯	নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী
১০০	হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস
১২০	আল কুরআনের অনুকরণ অসম্ভব
১২৯	মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনচরিত
১৪০	কুরআনের সামাজিক প্রভাব
১৪৩	কুরআন যেভাবে বিশ্বজুড়ে ন্যায়বিচার ছড়িয়ে দিলো
১৫৩	বিশ্বজুড়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারে কুরআনের ভূমিকা
১৬৪	কুরআনের আয়াতের প্রতিচ্ছবি
১৮৭	রেফারেন্স

যাত্রার শুরুতে বিস্ময়কর কুরআন

কুরআন কী? কীভাবে এলো এই মহাগ্রন্থ

মহান আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা জিবরাইল عليه السلام-এর মাধ্যমে নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর কুরআন অবতীর্ণ করেন। এই গ্রন্থ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে, সকল নবি-রাসূল আল্লাহ কতৃক প্রেরিত। কুরআনের বিভিন্ন দিকসমূহের মধ্যে এই ঘোষণা অন্যতম। কুরআন থেকে আমরা জানতে পারি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের মাঝে ইবরাহিম, মুসা, ঈসা عليه السلام সহ আরও অনেক নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ নবি হলেন মুহাম্মাদ ﷺ।

পৃথিবীতে কুরআনের প্রভাব অসীম। সপ্তম শতাব্দীতে আরব ভূখণ্ডে কুরআন অবতীর্ণ হলেও এতে রয়েছে সর্বকালের ও সমস্ত ভূখণ্ডের মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য বার্তা (Well Accepted Guideline)।

বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের সংখ্যা প্রায় ১৮০ কোটি, যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার চার ভাগের একভাগ। এই বৃহৎ জনসংখ্যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের মানুষ। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে কোথাও না কোথাও আল কুরআন পাঠ করা হচ্ছে। লাখো মানুষ গোটা কুরআন মুখস্থ করে মনের গহিনে জমিয়ে রাখছে। সযত্নে লিখে রাখছে হৃদয়ের শুভ্র পাতায়। সত্যি, ভাবলে অবাক হতে হয়! কুরআনে এমন কী আছে—যার জন্য শত কোটি মুসলিমের হৃদয়ে এই গ্রন্থ এত মজবুত আসন গাড়তে সক্ষম হয়েছে?

কুরআন একদিকে যেমন পৃথিবীর সর্বাধিক পাঠিত গ্রন্থ, অন্যদিকে তেমনি একে নিয়ে মানুষের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির ঘটনাও নেহাত কম নয়। আজকাল সবার মুখেই কুরআন নিয়ে কথা বলতে শোনা যায়। কুরআনের প্রভাব এতটাই পরিব্যাপক, আপনি এই গ্রন্থের নাম শুনুন বা না শুনুন, পড়ুন বা না পড়ুন—এটা ইতোমধ্যেই কোনো না কোনোভাবে আপনার জীবনকে প্রভাবিত করেছে। কুরআন অজান্তেই আপনার জীবনকে এমনভাবে রাঙিয়ে তুলেছে, যেটা আপনি কল্পনাও করতে পারেননি।

হয়তো ভাবতে পারেন, সব ধর্মই তো নিজেদের ব্যাপারে অলীক সব দাবি করে। আর বইগুলো যখন লেখা হয়েছে, তখন আমরা ছিলামও না, তাহলে আসল ঘটনা জানব কীভাবে? কীভাবে বুঝব এটাই সত্য? তাই ওসবে বিশ্বাস করা কি নিতান্তই অন্ধবিশ্বাস নয়?

মুসলিমরা কেবল বিশ্বাসের জোরে কুরআনকে আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থ বলে মেনে নেয় না; বরং কুরআন বাস্তবিকার্থেই একটা বিস্ময়ের নাম। এটা জীবন্ত মুজিজা— যা আমরা প্রত্যেকেই অনুভব করে থাকি। এমন জোরালো দাবির পেছনে অবশ্যই শক্ত প্রমাণ থাকতে হয়। আর এই শক্ত প্রমাণ কুরআন দিয়েছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উদাহরণ দিয়ে এবং মানুষের মধ্যে অতি প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন জাগিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। প্রমাণের অংশ হিসেবে কুরআন জায়গায় জায়গায় পাঠকদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। মানুষের মাঝে প্রচলিত বিভিন্ন ভুল ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। এভাবে মানুষের মধ্যে গেড়ে বসা ভুলগুলোকে উপড়ে ফেলে কুরআন সেখানে স্থাপন করেছে শক্তিশালী সত্যের ভিত।

আপনি যদি ধর্মগ্রন্থগুলো নিয়ে সন্দেহবাতিকতায় ভোগেন, যদি ভাবেন, এসব বই যতসব আজগুবি কথায় ভর্তি—যেগুলোর পর্যাপ্ত কোনো প্রমাণ নেই, তাহলে প্রস্তুত হোন চমকে যাওয়ার জন্য।

এই কুরআন কী শেখায়

জীবনের কোনো না কোনো ধাপে এসে আমাদের প্রত্যেকের মনেই একটা গভীর প্রশ্ন উঁকি দেয়। আর তা হলো—

‘আমি কী ছিলাম? কী করছি? আর আমার গন্তব্যই-বা কোথায়?’

আমরা যখন জীবনের এসব বাস্তবতা নিয়ে চিন্তা করি, তখন স্বাভাবিকভাবেই মনে এই বোধ জাগ্রত হয়, আমাদের একটা শুরু আছে। একটা সময় আমাদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না, কিন্তু এখন আমরা নিজের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছি। আমাদের হাত আছে, পা আছে, কান-চোখ-নাক-মুখ সবকিছুই আছে এবং এই সবকিছুকে পরিচালনা করার জন্য একটা মস্তিষ্কও আছে।

কুরআনের মৌলিক ভাববস্তু

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা প্রতি বিশ্বাস বা তাওহিদ

তাওহিদ হলো কুরআনের সবচেয়ে মৌলিক ভিত্তি। কুরআনের এই সারাংশ নিয়ে নাজিলকৃত সূরা ইখলাসে আল্লাহ বলেছেন—

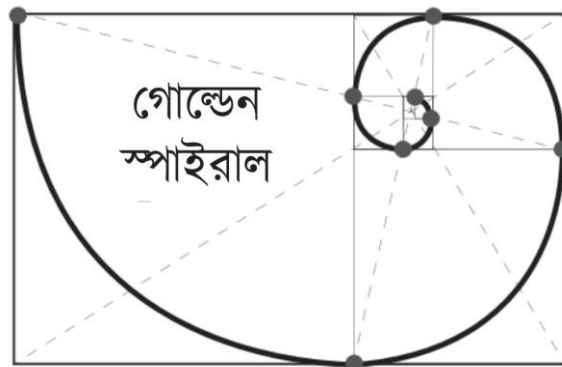
‘বলো, তিনিই আল্লাহ! এক (অদ্বিতীয়)। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউ-ই নেই।’ সূরা ইখলাস

কুরআনের এই সূরাকে বলা যায় তাওহিদ বা একত্ববাদের ম্যানুফেস্টো। তবে তাওহিদের অর্থ কেবল একত্ববাদ করা হলে সার্বিক ভাব প্রকাশ পায় না। এর অর্থ আরও ব্যাপক। এটা আমাদের বলে—আল্লাহ এক। এই ‘এক’ সেই ‘এক’ নয়, যেখানে এক হয়ে যায় ‘দুই’ আবার দুই হয়ে যায় ‘তিন’; এভাবে বাড়তেই থাকে।

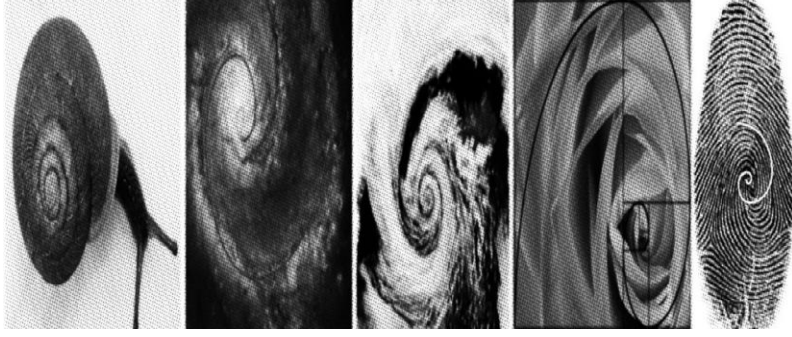
এখানে এক বলতে অদ্বিতীয়ভাবে একত্ব বোঝানো হয়েছে—যার দুই বা তিন হয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই; যেমনটা আমরা দেখতে পাই খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীদের কথার মাঝে।

প্রশ্ন আসে, কীভাবে আমরা জানব আমাদের স্রষ্টা এক ও অদ্বিতীয়? কেন তা দুই বা তিন হওয়া সম্ভব নয়?

এটার উত্তরের জন্য আমাদের নির্ভর করতে হবে আল্লাহ প্রদত্ত চিন্তাশক্তির ওপর। কেননা, এই চিন্তাশক্তি আমাদের চারপাশের বস্তু সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে এবং চিন্তা করতে শেখায়। ব্যাপারটা অনেকটা সেই চিত্র বিশেষজ্ঞের মতো, যিনি কোনো চিত্রকর্মের দিকে তাকিয়ে অঙ্কনের ধরন দেখেই বলে দিতে পারেন—এর শিল্পী কে।



গোল্ডেন স্পাইরাল সম্পর্কে হয়তো জানেন। গোল্ডেন স্পাইরাল এক বিশেষ ধরনের প্যাঁচ, যেমনটা ওপরের চিত্রে দেখতে পাচ্ছেন। প্রকৃতিতে অনেক সৃষ্টির মাঝেই গোল্ডেন স্পাইরাল দেখা যায়। এই রকম আকৃতির প্যাটার্ন দেখা যায়, এমন কিছু বস্তুর উদাহরণ হলো—আমাদের অতি পরিচিত শামুকের খোলস, গ্যালাক্সির আকার, ঘূর্ণিঝড়ের আকার, ফুল; এমনকী আমাদের ফিঙ্গারপ্রিন্টও।



এই প্যাটার্নগুলোকে আপনি ‘একই আদলের নকশা’ হিসেবে ধরতে পারেন। প্রকৃতির এই অভিন্ন আদলের নকশাগুলো দেখিয়ে দেয়, এই সমস্ত কিছুর স্রষ্টা একজনই।

পরকাল : আমার আদল গন্তব্য

কুরআন থেকে জানতে পারি, দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবন শেষে শুরু হবে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবন। আমাদের সবাইকে একসময় মৃত্যুবরণ করতে হবে; ফিরে যেতে হবে মহান রবের কাছে।

‘প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর ভালো ও মন্দ দ্বারা আমি তোমাদের পরীক্ষা করে থাকি এবং আমার কাছেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে।’ সূরা আশিয়া : ৩৫

কিন্তু পৃথিবীতে স্বল্পকালের জন্য আমাদের বসবাসের উদ্দেশ্য কী? কেন আল্লাহ আমাদের একবারেই সেই চিরন্তন জীবন দিলেন না?

কারণ, এটা আমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। পৃথিবীতে থাকার সময় আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে।

‘আর আমি তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা, ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর (হে নবি) আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদের, যারা তাদের ওপর বিপদ এলে বলে—“আমরা তো আল্লাহরই। আর নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।” সূরা বাকারা : ১৫৫-১৫৬

মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষক মূলত পরীক্ষার্থীকে যাচাই করে থাকেন। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই মানুষ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর হিকমাহ অপরিসীম। তিনি আমাদের অন্তরের খবরও জানেন। আমরা নিজেদের যতটুকু চিনি, তার চেয়ে অবশ্যম্ভাবীভাবে তিনি আমাদের বেশি চেনেন। আমাদের ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানেন।

‘অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার মন তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয়, তা আমি জানি। আমি তার ঘাড়ে অবস্থিত ধমনি অপেক্ষাও নিকটতর।’ সূরা ক্বাফ : ১৬

এই পরীক্ষা বা বিপদাপদসহ সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় আল্লাহ তায়ালার অসীম জ্ঞান ও পরিকল্পনার দ্বারা। আল্লাহ কেন আমাদের পরীক্ষা করেন এবং বিভিন্ন রকমের দুঃখ—কষ্টে ফেলেন?

এর পেছনে রয়েছে অনেক কারণ। যেমন—

১. কে সত্যিকারের বিশ্বাসী আর কে মুনাফিক, তা আমাদের সামনে প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য।

‘মানুষ কি মনে করে যে, “আমরা বিশ্বাস করি”—এ কথা বললেই ওদের পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেওয়া হবে? আমি তো এদের পূর্ববর্তীদেরও পরীক্ষা করেছিলাম। সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী।’ সূরা আনকাবুত : ২-৩

২. যারা দুনিয়ার জীবনে আসক্ত হয়ে পড়ে, দুনিয়াকেই পরম সত্য হিসেবে মনে করে আখিরাতের কথা ভুলে যায়, তাদের জন্য দুঃখ-দুর্দশাগুলো রিমাইন্ডার হিসেবে কাজ করে। এগুলো মানুষকে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে শেখায়। স্মরণ করিয়ে দেয় আল্লাহর নিয়ামতের ওপর আমরা কতটা নির্ভরশীল।

‘আর যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দূরে সরে যায়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে দীর্ঘ প্রার্থনাকারী হয়।’ সূরা ফুসসিলাত : ৫১

৩. মানুষের ধৈর্য অনেক কম। তা ছাড়া ভবিষ্যতের কোনো জ্ঞানও আমাদের নেই। তাই আল্লাহর দেওয়া কোনো পরীক্ষাকে আপাতদৃষ্টিতে ভীষণ তিক্ত ও খারাপ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা আমাদের জন্য কল্যাণই বয়ে আনে।

কেন কুরআনে বিশ্বাস রাখব

ধরুন, নবুয়তের সিলসিলা চালু আছে। একটা অজানা-অচেনা মানুষ এসে দাবি করল, ‘আল্লাহ আমাকে নবি হিসেবে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমাকে মেনে চলো!’

এ কথা শুনে আপনি প্রথমেই কী বলবেন? নিশ্চয় বলবেন, এই লোকটা আস্ত একটা উন্মাদ! তারপর তার কাছে প্রমাণ চাইবেন। কেননা, এত বড়ো দাবি তো প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করা যায় না! বেশিরভাগ মানুষেরই এই প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক। কেননা, এভাবেই মানুষ আশপাশে ছড়িয়ে থাকা মিথ্যুক ও উন্মাদদের থেকে আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বরদের আলাদা করতে পারেন।

আর কুরআনও আমাদের বলে, আল্লাহ তাঁর নবি-রাসূলদের সুস্পষ্ট প্রমাণসমেতই প্রেরণ করেছেন—


‘নিশ্চয়ই আমি রাসূলদের প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণ সহকারে।’ সূরা হাদিদ : ২৫

নবি-রাসূলগণ তাঁদের নবুয়ত ও রিসালাতের প্রমাণস্বরূপ আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন মুজিজা বা অলৌকিক নিদর্শন লাভ করেছেন। এগুলোর মাধ্যমে তাঁরা মানুষকে হিদায়াতের পথে ডাকতেন। যেমন : মুসা عليه السلام সাগরকে দুই ভাগ করে ফেলেছিলেন। ঈসা عليه السلام হাতের স্পর্শে বিভিন্ন রোগীকে সুস্থ করতেন এবং মৃতকে পুনর্জীবিত করতেন ইত্যাদি। কিন্তু এ মুজিজাগুলো ঘটেছিল বহু বছর আগে। বর্তমান যুগে এমন নিদর্শন আমরা দেখতে পাই না। তাই মুমিনদের এসব গ্রহণ করতে হয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে।

মুহাম্মাদ عليه السلام-এর মুজিজা হলো—আল কুরআন। মুসলিমরা বিশ্বাস করে, নবি-রাসূলদের নিকট প্রেরিত সকল মুজিজার মধ্যে আল কুরআনই শ্রেষ্ঠ। কেননা, এই মুজিজার বিশেষত্ব হলো—যে কেউ চাইলেই যে কোনো মুহূর্তে কুরআন পড়তে পারে এবং এই মুজিজার স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু ঠিক কী কারণে কুরআনকে শ্রেষ্ঠ মুজিজা বলা হয়, তা জানতে হলে কুরআনের দুনিয়ায় ক্ষণিকটা বিচরণ করে আসতে হবে। চলুন তাহলে, দেখে আসি এই গহ্বের কিছু অসাধারণ বলক...

স্রষ্টার ধারণা

কে তিনি?

কুরআনে ইবরাহিম -এর যে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, সেখানে বেশ চমৎকারভাবে স্রষ্টার ধারণা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—

‘নিশ্চয়ই হাতঃপূর্বে আমি ইবরাহিমকে সৎ পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং তাঁর সম্বন্ধে আমি সম্যক অবগত। যখন সে তাঁর পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল—“এই মূর্তিগুলো কী, যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছ?”

তারা বলল—“আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এদের পূজা করতে দেখেছি।”

সে বলল—“তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ।”

তারা বলল—“তুমি কি আমাদের নিকট সত্য এনেছ, নাকি কৌতুক করছ?”

সে বলল—“বরং তোমাদের প্রতিপালক তো (তিনিই, যিনি) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী। শপথ আল্লাহর! তোমরা চলে গেলে তোমাদের এই মূর্তিগুলোর ব্যাপারে আমি অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করব।”

অতঃপর সে তাদের বড়ো মূর্তিটি ছাড়া বাকি সবগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো—যাতে তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে।

তারা বলল—“আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি এমন আচরণ কে করল? নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘনকারী।”

কেউ কেউ বলল—“আমরা এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে শুনেছি, তাঁর নাম ইবরাহিম।”

তারা বলল—“তাঁকে লোকসম্মুখে উপস্থিত করো—যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে।”

তারা বলল—“হে ইবরাহিম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি এরূপ আচরণ করেছ?”

সে বলল—“বরং ওদের মধ্যে এই বড়োটিই করেছে। সুতরাং তোমরা তাকেই জিজ্ঞেস করো, অবশ্য যদি সে কথা বলতে পারে।”

তখন তারা মনে মনে চিন্তা করতে লাগল এবং একে অপরকে বলতে লাগল—“বরং তোমরাই তো সীমালঙ্ঘনকারী।”

অতঃপর তাদের মস্তক অবনত হয়ে গেল (এবং তারা বলল)— “তুমি তো জানোই যে, ওরা কথা বলতে পারে না।”

সে বলল—“তবে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুই ইবাদত করো, যা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না?” সূরা আশ্বিয়া : ৫১-৫৬

সাহিত্য সন্ধান কুরআনের অতুলনীয় সাহিত্যগুণ

সাহিত্যের কথা ভাবলেই মাথায় আসে বইয়ের পৃষ্ঠায় লিখিত শব্দ, বর্ণ ও উপমার কথা। কিন্তু আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি, কুরআন লিখিতভাবে নবির নিকট আসেনি, এসেছে মৌখিকভাবে। তিনি প্রথম প্রচারও করেছেন মৌখিকভাবে; লিখিতভাবে নয়।

অথচ মৌখিকভাবে প্রচার করতে গেলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে; লেখনীতে যার সম্ভাবনা একদমই কম।

একটু পরীক্ষার করা যাক—

লিখিত ও মৌখিক যোগাযোগের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

ধরুন কোনো সেমিনারে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আপনাকে বক্তৃতা দিতে বলা হলো। প্রস্তুতির সময়ও দেওয়া হলো একদম কম। ফলে অনেকটা প্রস্তুতিহীনভাবেই আপনাকে বক্তব্য দিতে হবে। সামনে শত শত উৎসুক শ্রোতা। অনেকে তির্যক প্রশ্ন করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। এই পরিস্থিতিতে বক্তব্যে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। তা ছাড়া এমন পরিস্থিতিতে গোছালো শব্দচয়নও সব সময় সম্ভব হয় না।

বিপরীত দিকে এই একই বিষয় যদি আপনাকে লিখিতভাবে উপস্থাপন করতে বলা হয়, তাহলে তা তুলনামূলক বেশি নির্ভুলভাবে হবে। কারণ, তখন আপনি ভেবে-চিন্তে লেখার সুযোগ পাবেন, ভুল হলে আবার সম্পাদনা করে সংশোধন করার ফুরসত পাবেন। ভাষায় লালিত্য আনার সুযোগ পাবেন। নিখুঁত শব্দচয়নে মনোযোগী হতে পারবেন।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন, লেখনির চেয়ে মৌখিক কথায় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

তাহলে প্রশ্ন জাগে, কুরআন মৌখিকভাবে প্রচারের পরও কেন এত নির্ভুল? কীভাবে সম্ভব এত বাগাড়ম্বর ও নিখুঁত শব্দচয়ন?

এটাই কুরআনের বিস্ময়!

বিভিন্ন উদ্ভূত পরিস্থিতির পেক্ষাপটে কুরআনের আয়াত নাজিল হতো এবং তা সাথে সাথেই রাসূল ﷺ অন্যদের জানিয়ে দিতেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন মানুষ এসে রাসূল ﷺ-কে হঠাৎ প্রশ্ন করতেন; এগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য কুরআনের আয়াত নাজিল হতো এবং নবিজি সাথে সাথেই মানুষকে মৌখিকভাবে শুনিয়ে দিতেন। যেমন : কুরআনের কিছু আয়াতে দেখা যায়—

‘আর তারা তোমাকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলো, “রুহ আমার রবের আদেশ থেকে, আর তোমাদের জ্ঞান থেকে অতি সামান্যই দেওয়া হয়েছে।”’ সূরা বনি ইসরাইল : ৮৫

‘তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, এ দুটোয় রয়েছে বড়ো পাপ এবং মানুষের জন্য উপকার, তবে তার পাপ তার উপকারিতার চেয়ে অধিক বড়ো। আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে—তারা কী ব্যয় করবে। বলো, যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন—যাতে তোমরা চিন্তা করো।’ সূরা বাকারা : ২১৯

নবিজি ﷺ যদি কুরআনের আয়াতগুলো নিজ থেকে বানিয়ে বলতেন এবং প্রচার করতেন, তাহলে সেখানে ব্যাপক ভুল থাকার সম্ভাবনা ছিল। এত নিখুঁত শব্দচয়ন কখনোই সম্ভব হতো না।

এই বিষয়গুলোরই ইঙ্গিত দেয়—কুরআন মানুষের বানানো কোনো কথা নয়; বরং মহান স্রষ্টার কথা। তিনি সর্বদা ‘ওয়েল প্রিপিয়ার্ড’। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—সব ব্যাপারেই তিনি জ্ঞাত। তাঁকে কোনো কিছু ভাবতে হয় না, প্রস্তুতি নিতে হয় না। তাই যে পরিস্থিতিতেই তাঁর পক্ষ থেকে কথা আসুক না কেন, তা হয় অতি নিখুঁত, নির্ভুল, গোছালো ও সত্য তথ্য সংবলিত।

বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য কুরআনের অসাধারণ সাহিত্য গুণাবলির কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যাক—

১. সূক্ষ্মতা

‘আল্লাহ কোনো ব্যক্তির দেহাভ্যন্তরে দুটি হৃদয় রাখেননি। তোমাদের যেসব স্ত্রীকে তোমরা “জিহার” করো, তাদেরকে আল্লাহ তোমাদের জননীও করেননি এবং তোমাদের পালক পুত্রদেরকেও তোমাদের প্রকৃত পুত্র করেননি। এসব তো হচ্ছে এমন ধরনের কথা—যা তোমরা সম্মুখে উচ্চারণ করো। কিন্তু আল্লাহ এমন কথা বলেন, যা প্রকৃত সত্য এবং তিনিই সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করেন।’ সূরা আহজাব : ৪

এই আয়াতটির لِرَجُلٍ শব্দটি দ্বারা পুরুষদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে (رَجُلٌ অর্থ : পুরুষ) তাই এর সঠিক অর্থ দাঁড়ায়—

‘তিনি কোনো পুরুষের ভেতর দুটো হৃদয় স্থাপন করেননি।’

লক্ষ করুন—যদি এর সাথে মহিলাদেরও ইঙ্গিত করা হতো, তাহলে **انسان** শব্দটির জায়গায় ‘ইনসান’ শব্দ ব্যবহার করা হতো। তখন তার অর্থ হতো— তিনি কোনো মানুষের ভেতরে দুটো হৃদয় দেননি। ফলে তা সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াত। কারণ, নারী গর্ভবতী অবস্থায় নিজের ভেতর সন্তানের হৃদয়কেও ধারণ করে, পুরুষ নয়।

সুবাহানাল্লাহ! ভাবের কত সূক্ষ্ম প্রকাশ!

২. বলিষ্ঠ ভাষার ব্যবহার

‘তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? যদি তা (কুরআন) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ থেকে (নাজিল) হতো, তবে অবশ্যই এতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত।’

সূরা নিসা : ৮২

আল্লাহ বলিষ্ঠভাবে বলেছেন, এখানে কোনো বৈপরীত্য বা স্ববিরোধী কথা পাওয়া যাবে না। এটি খুবই রাশভারী কথা। কিন্তু এই রাশভারী কথারও অতি সস্তা ব্যাখ্যা করে কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে চায় একটি ‘অন্ধকারে হাতের বেড়ানো’ সম্প্রদায়।

আল্লাহ বলেছেন—কুরআনে কোনো ‘বৈপরীত্য বা Contradiction’ নেই। এই পারিভাষিক বিষয়টাকে তারা কেবল ‘শব্দ (Word)’ হিসেবে ধরে নেয় এবং এই শব্দটা কুরআনে কতবার আছে, তা খোঁজা শুরু করে দেয়। তারা গুগলে সার্চ করে যখন দেখে এই শব্দটি একাধিকবার আছে, তখন তৃপ্তি সহকারে বলে বেড়ায়—‘এই দেখুন, কুরআনে অনেক বৈপরীত্য আছে। তার মানে কুরআন সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে আসেনি। কুরআন দিয়েই কুরআন ভুল প্রমাণিত হলো...’

গঠনামৃত; নির্ভুল কাঠামোয় স্রষ্টার নিদর্শন

গঠন ও সংযুক্তির দিক দিয়ে কুরআন অদ্বিতীয়। কুরআনের ১১৪টি সূরা নাজিলের ক্রমানুসারে সাজানো হয়নি। সূরাগুলোতে কখনো কখনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। শুরুতে দেখলে মনে হতে পারে, বিষয়বস্তুগুলো কেমন যেন একটু অগোছালো; কিন্তু মূল ঘটনা ভিন্ন। সাম্প্রতিক সময়ের কিছু গবেষণায় উঠে এসেছে, কুরআনের এই গাঠনিক বৈশিষ্ট্য খুবই উচ্চমানের। একে বলা হয় ‘রিং কম্পোজিশন’ বা ‘বলয়াকার গঠন’।

রিং কম্পোজিশন তত্ত্ব

ম্যারি ডগলাস তাঁর বই *Thinking in Circles: An Essay on Ring Composition*-এ রিং কম্পোজিশন তত্ত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। সহজভাবে বলতে গেলে রিং পজিশন হলো—কোনো লেখার একদম মাঝখানে একটা আয়না রাখার মতো। এতে করে প্রথম অর্ধাংশে যা উল্লেখ থাকবে, শেষ অর্ধাংশে সেসবের প্রতিফলন দেখা যাবে। অর্থাৎ শেষের দিকে আবারও একই বিষয় আলোচনায় আসবে। আর লেখার প্রধান অংশ বা মূল আলোচ্য বিষয় থাকবে কেন্দ্রে; মানে যেখানে আয়না ছিল, ঠিক সেখানে।

মনে করুন, আপনাকে আজকের দিনের একটা ছোটো দিনলিপি লিখতে বলা হলো। আপনার লেখায় যদি ‘রিং স্ট্রাকচার’ আনতে চান, তাহলে দিনলিপির একদম মাঝামাঝিতে থাকবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আর শুরু ও শেষের অংশে একই প্রসঙ্গে লেখা থাকবে। অর্থাৎ শুরু ও শেষের দিকের বিষয়গুলো সম্পর্কযুক্ত হবে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক—

১. সকালে ঘুম থেকে উঠলাম।
২. বাড়ি থেকে বের হলাম।

৩. হঠাৎ করেই আমার একজন বন্ধুর সাথে দেখা হয়ে গেল, যার সাথে সেই ছোটোবেলার পর আর কখনো দেখা হয়নি।

৪. বাড়ি ফিরে এলাম।

৫. ঘুমোতে চলে গেলাম।

এখানে দিনলিপি়র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বন্ধুর সাথে হঠাৎ দেখা হওয়া। তাই এইটা তালিকার একদম মাঝে রয়েছে। শুরুর দিকের ‘ঘুম থেকে ওঠা’, ‘বাড়ি থেকে বের হওয়া’ বিষয় দুটোর সাথে শেষের দিকের ‘বাড়ি ফেরা’, ‘ঘুমোতে চলে যাওয়া’ বিষয় দুটোর সম্পর্ক রয়েছে।

রিং কম্পোজিশনের সুবিধা কোথায়

রিং স্ট্রাকচারে ক্রম যেমন থাকে, তেমনি মূলভাবের দিকেও ফোকাস থাকে। এতে করে আমরা সহজেই মূল বিষয়বস্তু খুঁজে পেতে পারি। ম্যারি ডগলাস খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন—‘মূল অর্থ থাকবে মধ্যভাগে।’

কোনো বিষয় মনে রাখার জন্য এই ধরনের গঠন বেশ কার্যকর। সেক্সিক হুইটম্যান তার গবেষণায় দেখেছেন, প্রাচীনকালের কবিতাগুলোয় রিং কম্পোজিশনের অধিক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এতে প্রাচীন কবিগণ তাদের কবিতাগুলো সহজে মনে রাখতে পারতেন। কোথাও ভুলে গেলে বিষয়বস্তুগুলোর ক্রম চিন্তা করে চট করে ভুলে যাওয়া অংশ স্মরণে আনতে পারতেন।

নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী

ভবিষ্যতে কী ঘটবে—এ সম্পর্কে কুরআন কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, নবি-রাসূলগণও করেছেন। আবার অনেক ভণ্ড, প্রতারণাও দাবি করে—তারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানে। তাহলে এমন কোনো উপায় আছে কি, যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারব, কে সত্য নবি আর কে সুবিধাবাদী, ভণ্ড, প্রতারণা?

হ্যাঁ, উপায় আছে। তারা যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো করেছে, তা বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পারি, কে ভণ্ড আর কে সত্য। সাধারণত মিথ্যা নবি বা মিথ্যা ভবিষ্যৎ বক্তাদের কথা অসংলগ্ন ও অস্পষ্ট হয়। নির্দিষ্ট কোনো সময়ের কথা তারা বলে না। কারণ, এর মাধ্যমে তাদের অনুসারীদের পক্ষে সাময়িক ফায়দা হাসিল করা সহজ হয়।

এর উপযুক্ত উদাহরণ হলো—ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসি গুপ্তচর, সম্ভবত এ যাবৎকালের সবচেয়ে বিখ্যাত ও পরিচিত গুপ্তচর, নসট্রাদামাসের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো। তার বক্তব্যগুলোয় থাকত বিভিন্ন ফরাসি ও লাতিন পদ, বিভিন্ন অস্পষ্ট ঐতিহাসিক ইঙ্গিত, অ্যানাগ্রাম, বিভিন্ন শ্লেষাত্মক বাক্য, উদ্ভট বানান, অসম্পূর্ণ শব্দ, এলোমেলো শব্দের ক্রমসহ আরও অদ্ভুত অনেক বিষয়। মূলত তার ভবিষ্যদ্বাণী এতটাই অস্পষ্ট ছিল যে, অনেকেই সেগুলোকে শব্দের ধাঁধা বলত। এখানে এ রকম কিছু বক্তব্য ইংরেজিতেই দেওয়া হলো—যাতে পাঠক অর্থের অসংলগ্নতা বুঝতে পারেন—

‘To support the great troubled Cappe; the reds will march in order to clarify it; a family will be almost overcome by death, the red, red ones will knock down the red one.’¹⁹

‘The great swarm of bees will arise, Such that one will not know whence they have come; By night the ambush, the sentinel under the vines. City delivered by five babblers not naked.’²⁰

এর বাংলা করার চেষ্টা করা যাক—

‘বিপদগ্রস্ত মহান ক্যাপকে সহায়তা করার জন্য, লালেরা তা পরিষ্কার করার জন্য মার্চ করবে; এক পরিবার মৃত্যু দিয়ে প্রায় শেষ হয়ে যাবে, লালেরা লালদের শেষ করবে।’

‘মৌমাছিদের বিরাট এক বাঁকের উদয় হবে। কেউ জানবেও না কখন তারা এসে গেল; রাতেরবেলা হবে আক্রমণ, প্রহরী তখন আঙুর গাছের নিচে। শহর বিলিয়ে দিলো পাঁচ অনগ্ন আড্ডাবাজ।’

এই নসট্রাডামাস যদি সত্যিই কোনো নবি হতো, তাহলে এমন ধোঁয়াশায় ভরা বাক্যবাণের কী দরকার ছিল? পরিস্কারভাবে বললেই তো ঝামেলা চুকে যেত! মূলত ভণ্ডদের গোমড় এখানেই! তারা অস্পষ্টতাকেই নিরাপাদ মনে করে। কারণ, স্পষ্ট করে বললে মানুষ তার সত্যতা মিলিয়ে দেখতে পারে। এজন্যই আমরা দেখি—নসট্রাডামাস যখনই স্পষ্ট তথ্য-উপাত্ত, নির্দিষ্ট তারিখ, স্থান ও ঘটনা দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার চেষ্টা করেছে, তখনই তার ভণ্ডামি ধরা পড়ে গেছে। সে বলেছিল—১৭৩২ সাল নাগাদ মহামারি, দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধ মানবসভ্যতাকে গ্রাস করে নেবে—

‘আমি যখন এটি লিখছি (১৫৫৫ সাল), তা থেকে ১৭৭ বছর ৩ মাস ১১ দিন পর, মহামারি, দীর্ঘ দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ ও ভয়াবহ বন্যার কবলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে—আজ এবং সেই সময়ের, পূর্বের এবং বর্তমানের মধ্যকার পৃথিবী। জনসংখ্যা এতটাই কমে যাবে যে, চাষবাসের জন্য প্রয়োজনীয় মানুষও থাকবে না। আর ফসল ছাড়া জমিগুলো পড়ে থাকবে চাষের আগে প্রস্তুত করা মাটির বেশে, বছরের পর বছর।’

এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে ঘটার জন্য সে ১৭৭ বছর সময় নিয়েছিল, যাতে সে সুবিধামতো জায়গায় থাকতে পারে। সময়ের স্রোতে ১৭৭ বছরও একদিন কেটে যায়। হাজির হয় ১৭৩২ সন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় উলটো ফলাফল। সে বলেছিল—তখন দীর্ঘ দুর্ভিক্ষ হবে, অথচ এই সময়ে ইউরোপে বৃহৎ অর্থনীতির দুয়ার খুলতে থাকে। চারিদিকে একের পর এক শিল্পবিপ্লব হতে থাকে। জীবনযাত্রার মান অধিকতরও উন্নত হতে থাকে। জনশক্তির বৃদ্ধি ঘটে। এমনকী কৃষিক্ষেত্রও শিল্পায়িত হয়। সে বলেছিল কী, আর বাস্তবে ঘটেছে কী? কারও নবুয়ত মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার জন্য এমন একটি ভুলই যথেষ্ট।

হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস

আগের পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি, কুরআন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক সত্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। এবার আমরা দেখব—অতীত ঘটনাবলি সম্পর্কেও কুরআন এমন কিছু তথ্য দিয়েছে, যেগুলোর হদিস সেই সময়ে মেলা অসম্ভব ছিল।

বেশিরভাগ ইতিহাসই কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। কারণ, এটাই ইতিহাসের সাধারণ প্রবণতা। যে ঘটনাগুলো কালের অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে, তার বিশুদ্ধতা বিশ্লেষণ করা ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্লেষণ করার চেয়েও দুরূহ বিষয়। কারণ, ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করা যায়; কিন্তু যা ঘটে গেছে, তার ক্ষেত্রে কিছুই করার থাকে না।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

ধরুন, কেউ একজন দাবি করল—একদিন কোনো এক শহরে আর্থার নামের এক কিংবদন্তি সম্রাট জন্ম নেবে। শত বছর পর সত্যি সত্যিই দেখা গেল, এক শহরের রাজপরিবারে একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছে। পরিবার তার নাম রাখল আর্থার। পরবর্তী সময়ে বড়ো হয়ে সে মহান সম্রাট হয়ে গেল। তাহলে কি এটা প্রমাণিত হয়ে যাবে, ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া লোকটি ভবিষ্যতের জ্ঞান রাখে? না। কারণ, এই রকম ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়ার জন্য ভবিষ্যতের জ্ঞান রাখা জরুরি নয়। নিছক ধারণা বা কল্পনা থেকেও এ রকম উড়ন্ত ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়; যেখানে নির্দিষ্ট করে কোনো স্থান, কাল, পাত্রের উল্লেখ থাকে না। ওপরের ভবিষ্যদ্বাণীটি কয়েকভাবে বাস্তবে ঘটতে পারে—

প্রথমত, রাজপরিবারে প্রত্যেক প্রজন্মেই কোনো না কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করে। যেহেতু ভবিষ্যদ্বাণীতে নির্দিষ্ট করে কোনো সময় বা স্থানের নাম উল্লেখ নেই, তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই সময়ের পরিক্রমায় কোনো এক কালে কাকতালীয়ভাবে কোনো রাজপুত্রের নাম আর্থার হতে পারে এবং সে পরবর্তীকালে সম্রাট হতে পারে! এটা মোটেও অসম্ভব কিছু নয়।

দ্বিতীয়ত, কেউ ইচ্ছা করেই রাজপুত্রের নাম অর্থার রাখতে পারে। কারণ, তার পরিবার হয়তো এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে জেনে থাকবে। তাই কৌশলে এটার ফায়দা ঘরে তুলতে চাইবে। তারা জনগকে বলবে—‘এই পুত্রই সেই মহান সম্রাট, যার কথা প্রাচীন জ্যোতিষী নিজের ভবিষ্যদ্বাণীতে বলে গেছেন।’ এতে জনগণের বাড়তি ভক্তি আদায় করা সম্ভব হবে।

এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীকে বলা হয় ‘Self-Fulfilling Prophecy’। অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণী নিজেই নিজেকে বাস্তবে রূপদান করে।

এবার এই একই রকম ঘটনা অতীতের সাথে তুলনা করুন।

কেউ যদি এমন কোনো প্রাচীন সভ্যতা বা শাসকের ব্যাপারে তথ্য দেয়— যাদের নাম কেবল গল্পেই শোনা যায়, কিন্তু বাস্তবে চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা কোথায় ছিল, কীভাবে ধ্বংস হয়েছিল এবং কোথায় তাদের সমাধি রয়েছে, এ ব্যাপারে কোনো তথ্য বা দলিলাদি নেই। এই ভবিষ্যদ্বক্তা যদি নির্দিষ্ট করে সেই হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন সভ্যতার স্থান বা সম্রাটের সমাধির স্থান বলে দেয়, আর সেই জায়গায় সত্য সত্যই সম্রাটের নামফলক সংবলিত কবর পাওয়া যায় এবং তা প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সত্য বলে প্রমাণিতও হয়, তাহলে তথ্যদানকারীর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আর কোনো সন্দেহ থাকবে?

না, থাকবে না। কেননা, অতীত ঘটনার ক্ষেত্রে কোনো ধারণা চলে না, নিশ্চিত বা অকাট্য জ্ঞান থাকতে হয়। অতএব, কেউ যদি অতীত সম্পর্কে তথ্য দেয় এবং অনুসন্ধান করে বাস্তবে তার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়—তথ্যদানকারী সত্যবাদী ও সঠিক। তাই হারিয়ে যাওয়া অতীত সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য দেওয়া ভবিষ্যদ্বাণী করার চেয়েও কঠিন কাজ।

আল কুরআনের অনুকরণ অসম্ভব

কুরআন মানবজাতির দিকে একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে—

‘আমার বান্দার ওপর যা নাজিল করেছি, তা নিয়ে যদি তোমদের সন্দেহে থাকে, তাহলে তার মতো একটি সূরা নিয়ে এসো...’ বাকারা : ২৩

কুরআনের মতো আরেকটি বই লিখে ফেলা কখনোই সম্ভব নয়; এটাই সম্ভবত কুরআনের সবচেয়ে বড়ো অলৌকিকত্ব। ১৪ শতাব্দী যাবৎ কেউ-ই এই চ্যালেঞ্জে জিততে পারেনি। কুরআন শক্তভাবে দাবি করে, কোনো মানুষের পক্ষে কুরআনের একটা সূরার অনুরূপ সূরা রচনা করাও সম্ভব নয়; এমনকী সব মানুষ-জিনও যদি এক হয়ে নেমে পড়ে, তবুও না।

‘যদি মানুষ ও জিন কুরআনের অনুরূপ হাজির করার জন্য একত্রিত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ হাজির করতে পারবে না; একে অপরের সাহায্যকারী হয়েও।’ সূরা বনি ইসরাইল : ৮৮

চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীদের সামনে কুরআন একটি আদর্শ নকশার মতো। এটাকে অনুসরণ করে এর মতো করে একটি সাহিত্য রচনা করতে হবে। যেটা সার্বিক দিক বিবেচনায় কুরআনের মানে মানোত্তীর্ণ হবে। একই সঙ্গে পণ্ডিতদের মাধ্যমে মূল্যায়নও করাতে হবে।

কুরআন চ্যালেঞ্জ করে বলেছে—কুরআনের মতো আরবি সাহিত্য এর আগেও কেউ রচনা করতে পারেনি; ভাবিষ্যতেও পারবে না।

চ্যালেঞ্জের স্বরূপ

ইসলামের স্বর্ণযুগের আলিমদের মতে—আয়াতগুলো নিঃসংকোচের সাথে যেকোনো যুগের ভাষাবিদ, সাহিত্যিকদের এই চ্যালেঞ্জে আহ্বান করে। এজন্য সকলের কাছে দেওয়া আছে আরবি ভাষার ২৮টি বর্ণ এবং কিছু ব্যাকরণিক নিয়ম।

কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই কুরআনের এই চ্যালেঞ্জকে ভুলভাবে বোঝে। তারা মনে করে, হয়তো কুরআনের মতো সুন্দর শোনাতে এমন কিছু লিখলেই হবে, কিন্তু না। কারণ, সাহিত্যমানের বিচার একেকজনের কাছে একেক রকম। কেউ যদি বলে—তাদের কাছে কুরআনের চেয়ে কোনো গল্প বা কবিতার অংশ বেশি ভালো লাগে, লাগতে পারে।

তাই কুরআনের এই চ্যালেঞ্জে কেবল সাহিত্যগুণই নয়; বরং কুরআনের বর্ণনার বিশেষ ভঙ্গিমা। অনেকে ভাসাভাসাভাবে কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি নকল করেছেন বইকি; রাসূল ﷺ-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত, কিন্তু এ রকম প্রতিটি চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। দেখা গেছে, বর্ণনাভঙ্গি নকল করতে গিয়ে ভাষাগত উৎকর্ষ একদম তলানিতে ঠেকেছে।

আরবি ভাষায় পারদর্শী যে কারও পক্ষে উচ্চমানের আরবি সাহিত্য রচনা করা সম্ভব। কবিতা-গল্পের মাঝে নিজের চিন্তা-ভাবনাকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু কেউ-ই কুরআনের মতো একই সঙ্গে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলে সাহিত্য রচনা করতে পারেনি, পারবেও না। কুরআনের অনন্য ভঙ্গির কারণে আরবি সাহিত্যে নতুন ও স্বতন্ত্র একটি ধারা সৃষ্টি হয়েছে। বিখ্যাত ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ আর্থার জে. আরবেরি বলেন—

‘কুরআন কোনো গল্প বা কবিতা নয়; বরং দুইয়ের সম্মিলনে অনন্য এক রচনা।’

মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনচরিত

বিস্ময়কর এক চরিত্র

ইতঃপূর্বে আমরা কুরআনকে স্রষ্টার বাণী হিসেবে মেনে নেওয়ার অনেকগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক কারণ দেখিয়েছি। এবার আমরা দেখব—সেই কুরআনের শিক্ষা জীবনে বাস্তবায়ন করলে কেমন মহামানবে পরিণত হওয়া যায়। কুরআন নাজিলের মূল উদ্দেশ্য হলো—মানুষকে সরল পথ দেখানো।

‘এই কিতাব আমি তোমার (রাসূলুল্লাহ ﷺ) প্রতি অবতীর্ণ করেছি— যাতে রবের হুকুমে তুমি মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোতে এবং পরাক্রমশালী, প্রশংসিতের পথে নিয়ে আসতে পারো।’ সূরা ইবরাহিম : ১

কুরআনের বাণীকে নিজের জীবনে সর্বভ্রমভাবে বাস্তবায়ন করেছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি ছিলেন কুরআনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. -কে যখন নবিজি ﷺ-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হয়, তখন তিনি বলেছিলেন—‘তুমি কি কুরআন পড়োনি? তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন।’

মুহাম্মাদ ﷺ-এর মহান চরিত্রের পূর্ণ বর্ণনা এত ছোটো কলেবরে দেওয়া অসম্ভব। তবুও প্রয়োজনীয় কিছু উদাহরণ এখানে উল্লেখ করছি—যাতে আমরা বুঝতে পারি, কেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবন মানবজাতির জন্য আদর্শ।

১. নম্রতা

‘...আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে ভালোবাসেন না।’ সূরা লুকমান : ১৮

যখন কোনো রাজা-বাদশাহ বা সেনাপতির কথা ভাবেন, তখন আপনার কল্পনায় কেমন চিত্র ভেসে ওঠে? সুবিশাল প্রাসাদ, ক্ষমতা-প্রতিপত্তির সঙ্গে দামি খাবার, দামি পোশাক—এগুলোই তো, তাই না? কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সম্পূর্ণই ভিন্ন। তিনি ২৩ বছরের নবুয়তের জীবন পার করেছেন খুবই সাদামাটা ও অনাড়ম্বরভাবে।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর একজন সাহাবি সাহল ইবনে সাআদ ﷺ রাসূলের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে বলেন—

‘আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যখন দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন, তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রাসূল ﷺ কখনো মিহি ময়দা দিয়ে তৈরি রুটি দেখেননি।’

তিনি খাবার অপচয় পছন্দ করতেন না। তাঁর ঘরে কখনোই উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত খাবার থাকত না। তিনি গরিব এবং প্রতিবেশীদের খাওয়ানোর ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রেখে উদরপূর্তি করে খেল, সে ঈমানদার নয়।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে কোনো খাবার হাজির করা হলে কখনো খাবারের দোষ ধরতেন না। তিনি সব দাওয়াতই গ্রহণ করতেন; এমনকী সেখানে যদি বাসি যব দিয়ে তৈরি স্বাদহীন খাবারও পরিবেশিত হতো, তবুও।

রাসূল ﷺ-এর থাকার জায়গাও ছিল অনাড়ম্বর। উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত একটি হাদিস থেকে জানা যায়—একবার তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘরে গিয়ে দেখলেন, নবিজি ﷺ খেজুর পাতার তৈরি চাটাইয়ে শুয়ে আছেন। মাথা রেখেছেন চামড়া ও খেজুর গাছের বাকল দিয়ে তৈরি বালিশের ওপর। রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে উমর ﷺ-কে অভ্যর্থনা জানালেন। উমর ﷺ দেখলেন, চাটাইয়ের ভাঁজ নবিজির শরীরে দাগ কেটে দিয়েছে। এটা দেখে উমর ﷺ কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আল্লাহর রাসূল উমর ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন, ‘কাঁদছ কেন?’

উমর ﷺ বললেন, ‘পারস্য আর রোমের বাদশাহরা কত শান-শওকতে থাকেন! আল্লাহর নবি এর চেয়েও বেশি শান-শওকতের যোগ্য।’

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন—‘এটাতেই আমাদের খুশি থাকা উচিত! কারণ, অন্যরা দুনিয়ায় সুখ পেলেও আমাদের জন্য রয়েছে আখিরাত তথা পরকালের সুখ।’

কুরআনের সামাজিক প্রভাব

ইসলাম আসার পূর্বে

পুরো পৃথিবীতে চলছিল জুলুম ও অবিচারের রাজত্ব। ইসলামপূর্ব আরব ছিল আরও জঘন্য। নৈতিকতার প্রশ্নে আরবদের অবস্থান ছিল তলানিতে। অর্থনীতির বড়ো একটা অংশজুড়ে ছিল দাসপ্রথার ভূমিকা। দাসদের পশুর মতো করে কেনাবেচা করা—হতো। আরব সমাজের সবচেয়ে নির্যাতিত শ্রেণি ছিল দাস। মদ, জুয়া, পতিতাবৃত্তি চলত সব জায়গায়। ক্ষমতাধর ব্যক্তির গরিবদের চড়া সুদে টাকা ধার দিত, আর সেই অর্থ আদায়ে জন্য চলত অকথ্য নির্যাতন।

আরব ছিল পুরুষের একক আধিপত্যের সমাজ। নারীদের সামাজিক কোনো গুরুত্ব ছিল না। ছিল না পৈতৃক সম্পত্তির ওপর তাদের কোনো ভাগ। কন্যা শিশুর জন্মের কথা শুনলেই বাবারা লজ্জায় মুখ লুকাত। চলত কন্যা শিশুদের জীবন্ত কবর দেওয়ার নৃশংস কর্ম। বিয়ে করার ক্ষেত্রে ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম ছিল না। বাবা মারা গেলে ছেলে তার বিধবা বিমাতাদের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করত।

গোত্রে গোত্রে রক্তপাত, হানাহানি, ছিনতাই, রাহাজানি ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলত এই বিবাদ। একবার এক গোত্রের জনৈক ব্যক্তি অন্য গোত্রের মালিকানাধীন একটি উট মেরে ফেলে। এই কারণে শুরু হয় ভয়াবহ যুদ্ধ, যা স্থায়ী হয়েছিল দীর্ঘ চল্লিশ বছর। এতে দুইপক্ষেরই বহু মানুষ হতাহত হয়েছিল।

হয়তো বুঝতে পারছেন, কেন ইসলামপূর্ব আরব ইতিহাসের এই সময়কে ‘আইয়্যামে জাহেলিয়াহ’ বা অজ্ঞতার যুগ বলা হয়। যদি আমাদের বলা হতো—

এই সমাজকে পুনর্গঠন করতে হবে, কী প্রতিক্রিয়া হতো আমাদের? মনে মনে তো বলতাম—‘ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি!’ এমন একটি সমাজ থেকে যাবতীয় খারাপ দিক মুছে ফেলতে কত সময় লাগত? পুরো জীবন এর পেছনে ব্যয় করলেও কি সফলতা আসত, নাকি কয়েক প্রজন্ম লাগত? কারও কারও কাছে তো এটি অসম্ভব বলেও মনে হতো!

কাজটা কতটা কঠিন?

এই বিষয়টি বুঝতে গত শতকের পশ্চিমা ইতিহাস থেকে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৯২০ সালে নৈতিকতা ও স্বাস্থ্যগত ক্ষতির দিক বিবেচনা করে পুরো আমেরিকায় মদ নিষিদ্ধ করা হয়। মদ উৎপাদন, আমদানি, বিক্রি, পরিবহন—সবই তখন বেআইনি ঘোষণা করা হয়। আইন প্রণয়নের পর, শুরুর দিকে মদের কেনাবেচা কমে যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে আবার তা বাড়তে থাকে; এমনকী লাগামছাড়া হয়ে যায়। কারণ, তখন বাড়িতে বাড়িতে মদ তৈরি শুরু হয়—কোনোরূপ রাষ্ট্রীয় অনুমতি ছাড়াই। ঘরে মদ তৈরি করায় অনেকের বাসায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়। শিশু ও মহিলারা অসুস্থ হতে থাকে। মদের ক্রেতারাও এসব চোলাই মদ খেতে শুরু করে, যা আগের ব্র্যান্ডেড মদের চেয়ে বেশি পরিমাণে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে ফেলে। অন্যদিকে ব্র্যান্ডেড মদের কালোবাজার তৈরি হয়। সেখানে নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার জন্য শুরু হয় গ্যাং-মাফিয়াদের দ্বন্দ্ব। অন্যদিকে মানুষের মধ্যে মদ্যপানজনিত কারণে বেড়ে যায় মৃতের সংখ্যা।

এভাবে সমাজ থেকে একটা অপরাধ তুলতে গিয়ে অনেকগুলো অপরাধ ডেকে এনেছিল সভ্যদের সমাজ। ১৯৩৩ সালে এই আইন রদ করা হয়। এবার কুরআনের কথা ভাবুন। কুরআনের আলোয় অসভ্যতার আঁধারে ডুবে থাকা সমাজও একসময় আলোকিত হয়েছিল। শুধু মদ নয়; জাহেলিয়াতের শেষ চিহ্নটুকুও সমাজ থেকে মুছে গিয়েছিল এবং তা মাত্র এক প্রজন্ম-সময়কালের মধ্যেই; ২৩ বছরে! এ রকম বিপ্লব বিশ্ব আর কখনোই দেখেনি।

কুরআন যেভাবে বিশ্বজুড়ে ন্যায়বিচার ছড়িয়ে দিলো

কুরআন কীভাবে স্বল্প সময়ের মাঝে আরবদের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছিল এবং সারা বিশ্বে শান্তি ও ন্যায়বিচারে শাসন ছড়িয়ে দিয়েছিল, তা জাফর ইবনে আবু তালিব রাঃ-এর বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। আবিসিনিয়ায় হিজরতের পর সেখানকার রাজার কাছে তিনি বর্ণনা করেছিলেন, কীভাবে রাসূল সঃ ও কুরআন আরবদের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। তিনি বলেন—

‘জনাব, আমরা ছিলাম অসভ্য জাতির অন্তর্গত। মূর্তিপূজা করতাম। মৃত পশুর মাংস খেতাম। জঘন্য ধরনের কাজ করতাম। পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল না; ছিল শুধু বিবাদ, হানাহানি। আমাদের মাঝে শক্তিশালীরা দুর্বলদের ওপর নির্যাতন চালাত।

এরপর আল্লাহ আমাদের মাঝে তাঁর নবি সঃ-কে পাঠালেন। আমরা তাঁর সম্ভ্রান্ত বংশ, সততা, আমানতদারিতা ও ক্ষমাশীলতার ব্যাপারে আগে থেকেই জানতাম। তিনি আমাদের ডাকলেন তাওহীদের পথে। বললেন—বাপ-দাদাদের মূর্তিপূজা ছেড়ে এক ও অদ্বিতীয় মহান রবের ইবাদত করতে। আমাদের সত্য কথা বলার নির্দেশ দিলেন। আতিথেয়তা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ধরে রাখতে বললেন। মারামারি, খুনোখুনি, মিথ্যা কথা বলা, ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা, নারীদের ওপর অপবাদ আরোপ করাসহ সকল প্রকার অপরাধ ও খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে বললেন।

আদেশ দিলেন কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করতে। আল্লাহ সাথে কাউকে শরিক করার ক্ষেত্রে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। আমাদের কাছে সালাত, জাকাত ও সাওমের মতো বিধিবিধানগুলো পেশ করলেন।

আমরা সত্যের ওপর ঈমান আনলাম এবং তাঁর কথা অনুসরণ করলাম। তিনি আল্লাহর কাছ থেকে যা পেয়েছেন, আমরা সেসব মেনে নিলাম।’

এভাবেই আরবের মানুষ পরিবর্তিত হয়েছিল। হয়েছিল নতুন এক সভ্যতার মশালধারী। যে নতুন সভ্যতা মানব ইতিহাসের গতিপথ চিরতরে পালটে দিয়েছিল। নবি মুহাম্মাদ সঃ ও সাহাবা

আজমাইনগণ কেবল নিজ অঞ্চলের মানুষদের জুলুম থেকে মুক্ত করেই ক্ষান্ত হননি; বরং সত্যের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন দূর থেকে দূরান্তরে।

কুরআন মুসলিমদের মজলুমের পাশে দাঁড়াতে বলে। মজলুমের জন্য লড়াই করতে বলে; চাই মজলুম যে জাতির, যে স্থানেরই হোক না কেন।

‘আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না? অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, “হে আমাদের রব! আমাদের বের করুন এ জনপদ থেকে—যার অধিবাসীরা জালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।”’ সূরা নিসা : ৭৫

আল্লাহর এই হুকুম মুসলিমদের উজ্জীবিত করেছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নির্যাতিত মানুষদের শিকলমুক্ত করতে। ইতিহাস স্বীকৃতি দেয়—মুসলিমরা সিরিয়া, মিশর ও স্পেন থেকে জুলুমের অবসান ঘটাতে কতটা ভূমিকা পালন করেছে।